কম্পিউটার পেরিফেরাল ও কম্পিউটার আর্কিটেকচার

কম্পিউটার আর্কিটেকচার

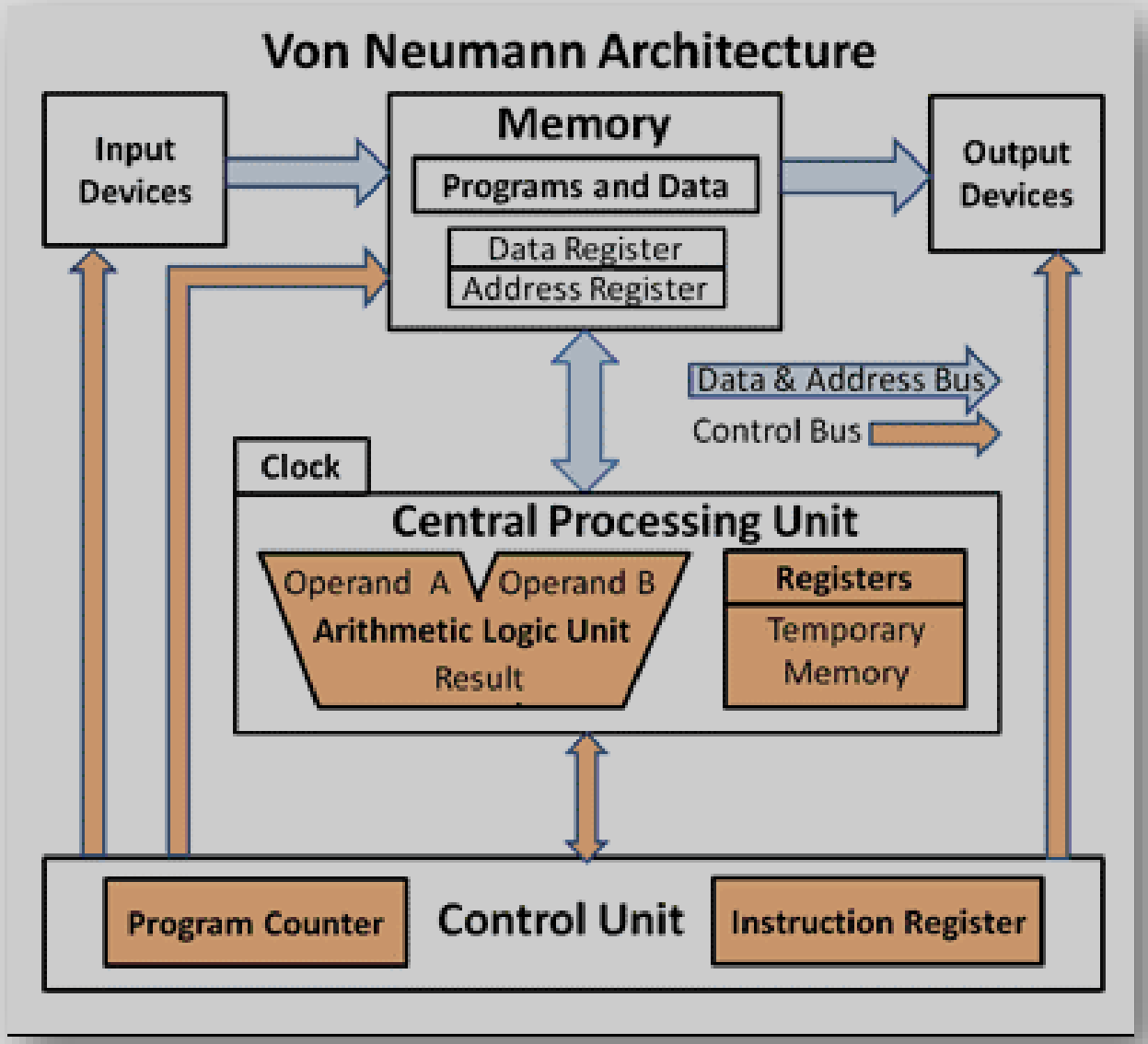

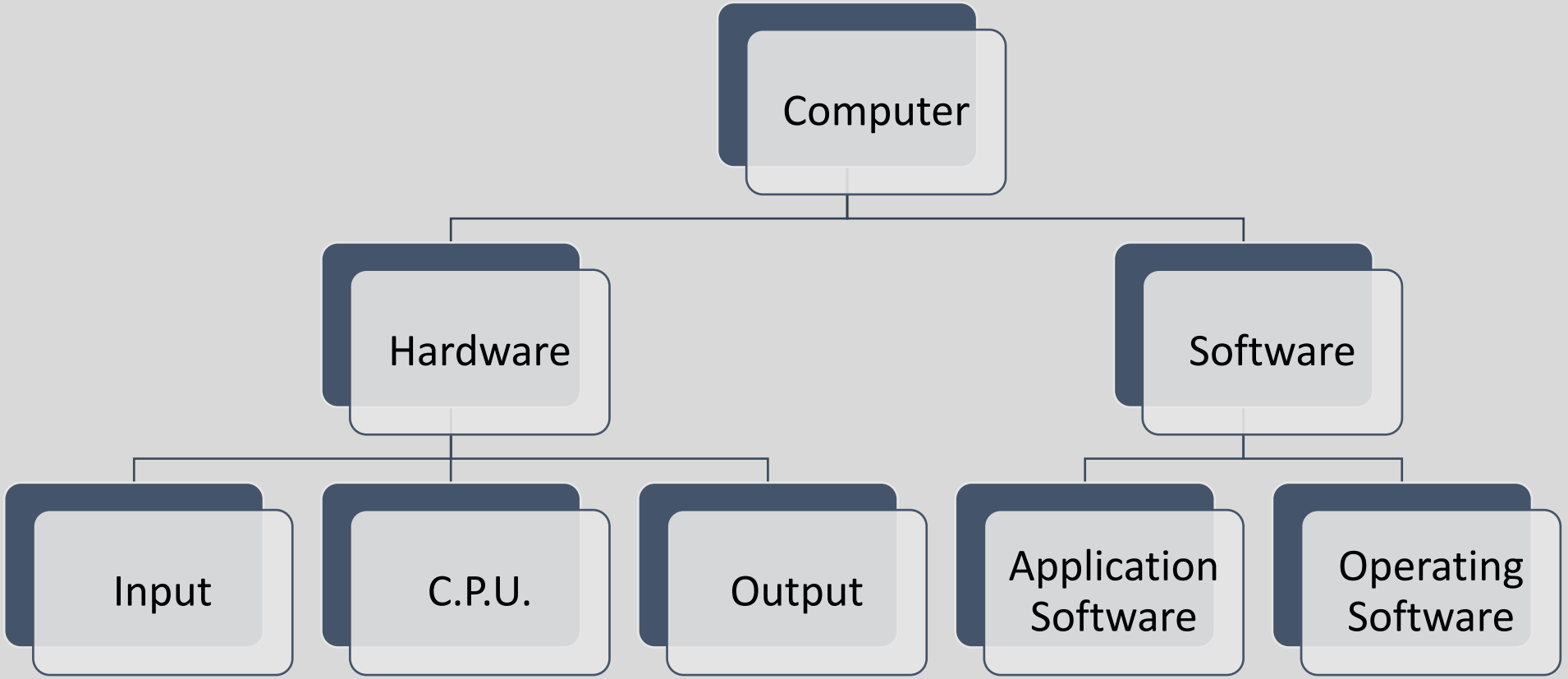
Computer
Hardware
Software
Input
C.P.U.
Output
Application Software
Operating Software

কম্পিউটার সিস্টেম

কম্পিউটার সিস্টেমের **কাজ ৪টি**।

- ইনপুট
- প্রসেসিং
- আউটপুট
- স্টোরেজ

হার্ডওয়ার

কম্পিউটারে ব্যবহৃত সকল ভৌত যন্ত্রপাতি ও ডিভাইস।

তিনভাগে বিভক্ত-

সিপিইউ-

গাণিতিক যুক্তি অংশ, কন্ট্রোল ইউনিট, মেমোরি বা রেজিস্টার অংশ

ইনপুট ডিভাইস

আউটপুট ডিভাইস

সিপিইউ (CPU)

কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে, তাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলে। কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় অংশ হলো সিপিইউ। কম্পিউটারের কাজ করার গতি ও ক্ষমতা সিপিইউ'র উপর নির্ভরশীল। এটি কম্পিউটারের সকল প্রকার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

সিপিইউ এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোর কাজ সম্পাদনা করা ছাড়াও স্মৃতি, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসগুলোর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বড় কম্পিউটারে এক বা একাধিক সার্কিট বোর্ডে কয়েকটি মাইক্রোপ্রসেসর এবং অন্যান্য সমন্বিত সার্কিটের সমন্বয়ে সিপিইউ গঠিত হয়। সিপিইউ কম্পিউটারের 'ব্রেইন' ও 'হৃদপিন্ড' স্বরূপ।

সিপিইউ (CPU)

সিপিইউ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত –

- নিয়ন্ত্রণ অংশ বা কন্ট্রোল ইউনিট
- গাণিতিক যুক্তি অংশ বা Arithmatic Logic Unit (ALU)
- রেজিস্টার সেট

নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)

এটি রেজিস্টারসমূহ এবং গাণিতিক যুক্তি অংশের মধ্যে ডেটার আদান-প্রদান তদারকি করে এবং গাণিতিক অংশ কী কাজ করবে তার ইন্সট্রাকশন প্রদান করে। এছাড়া কম্পিউটারের সকল অংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও সময় নির্ধারণ সংকেত প্রদান করে। এটি কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসরের একটি অংশ যা কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

গাণিতিক যুক্তি অংশ
(Arithmetic Logic Unit)

এটি কম্পিউটারের ইন্সট্রাকশনগুলোর নির্বাহ (Execution) কাজ করার জন্য মাইক্রোঅপারেশনগুলো পালন করে। এ ইউনিট হচ্ছে কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর স্বরূপ, সকল গাণিতিক কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যুক্তিমূলক কাজও সাধন করে। মূলত কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করে।

রেজিস্টার সেট

প্রক্রিয়াকরণের সময় অস্থায়ীভাবে ডেটা সংরক্ষণের জন্য সিপিইউ এর ভিতের ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে গঠিত রেজিস্টারসমূহ প্রয়োজন হয়। এই রেজিস্টারগুলো হলো অ্যাকিউমুলেটর রেজিস্টার, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার, অ্যাড্রেস রেজিস্ট্রার, সাধারণ রেজিস্টার, বিশেষ ব্যবহার কার্যের জন্য রেজিস্টার ইত্যাদি। এগুলো মাইক্রোপ্রসেসরে থাকে।

মাইক্রোপ্রসেসর

আইসি প্রযুক্তির উন্নতির ধারায় কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের সকল উপাদানকে একটি মাত্র চিপে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। একে মাইক্রোপ্রসেসর বলে। এই চিপের অভ্যন্তরে মূলত প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিট থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইনটেল (Intel) কর্পোরেশন ড. টেড হাফ এর তত্ত্বাবধানে ১৯৭১ সালে সর্ব প্রথম মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করে। এটি ছিল ইনটেল-৪০০৪, এটি মাত্র ৪ বিট নিয়ে কাজ করত। মাইক্রো প্রসেসর ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মধ্য সংযোগ সাধন করে। মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কার্যত সিপিইউকে বুঝায়।

মাইক্রোপ্রসেসর

VLSI (Very Large Scale Integration)- মাইক্রো কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট VLSI প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করা হয়।

মাইক্রো কম্পিউটারের ক্ষমতা মূলত প্রসেসরের উপর নির্ভরশীল। তাই সি.পি.ইউ এর এই অংশই মূলত কম্পিউটারের ব্রেইন।

মাইক্রোপ্রসেসর

1. CISK Processor: এ প্রসেসরে তুলনামূলকভাবে অধিক জটিল নির্দেশনা ব্যবহার করা হয় । এসেম্বলি ল্যাংগুয়েজে প্রোগ্রামিং এর জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী।

উদাহরণ : Intel-Pentium, IBM Blue Lighting

2. RISK Processor: এ প্রসেসরে তুলনামূলকভাবে সরল ও ক্ষুদ্রাকৃতির নির্দেশনা ব্যবহার করা হয় । হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজে প্রোগ্রামিং এর জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী।

উদাহরণ : Motorola Power PC-610, DEC Alpha-21064.

3. Special Purpose Processor: মূল প্রসেসরের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এ ধরনের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়। বিশেষ কোন। কাজে এ প্রসেসর কার্যকরী। উদাহরণ : Coprocessor.

মাদারবোর্ড

কম্পিউটারের প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডকে বলা হয় মাদারবোর্ড। এই বোর্ডের উপর কম্পিউটারের CPU এর সকল কম্পোনেন্ট (RAM, ROM, HDD, Processor) বসানো থাকে। একে অনেকে Mainboard ও বলে থাকে।

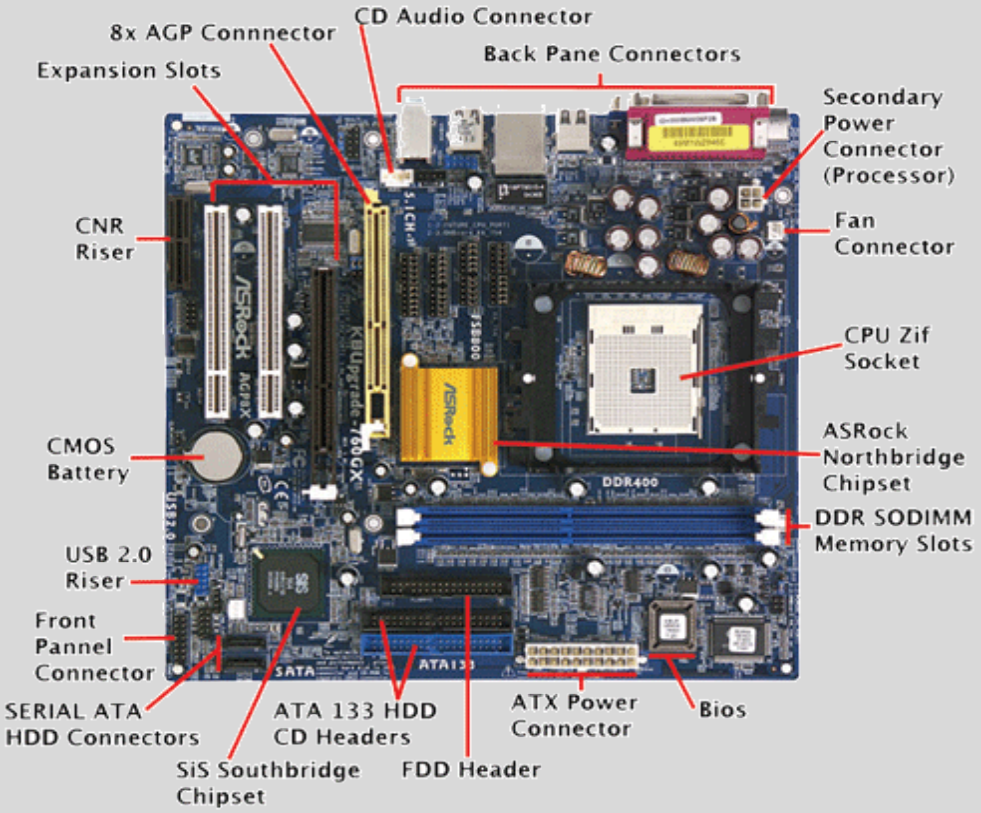

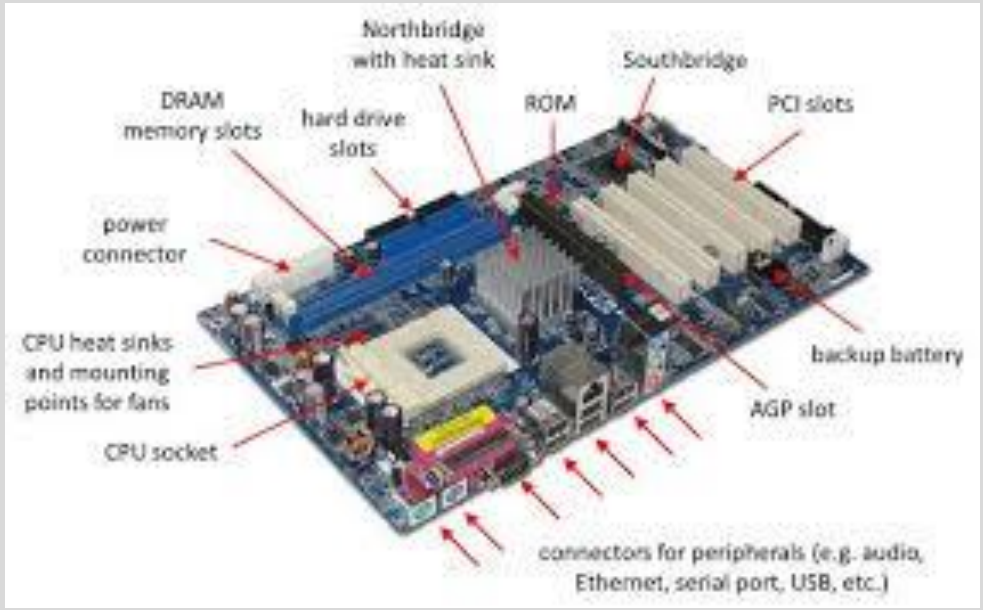

Inside of a computer case

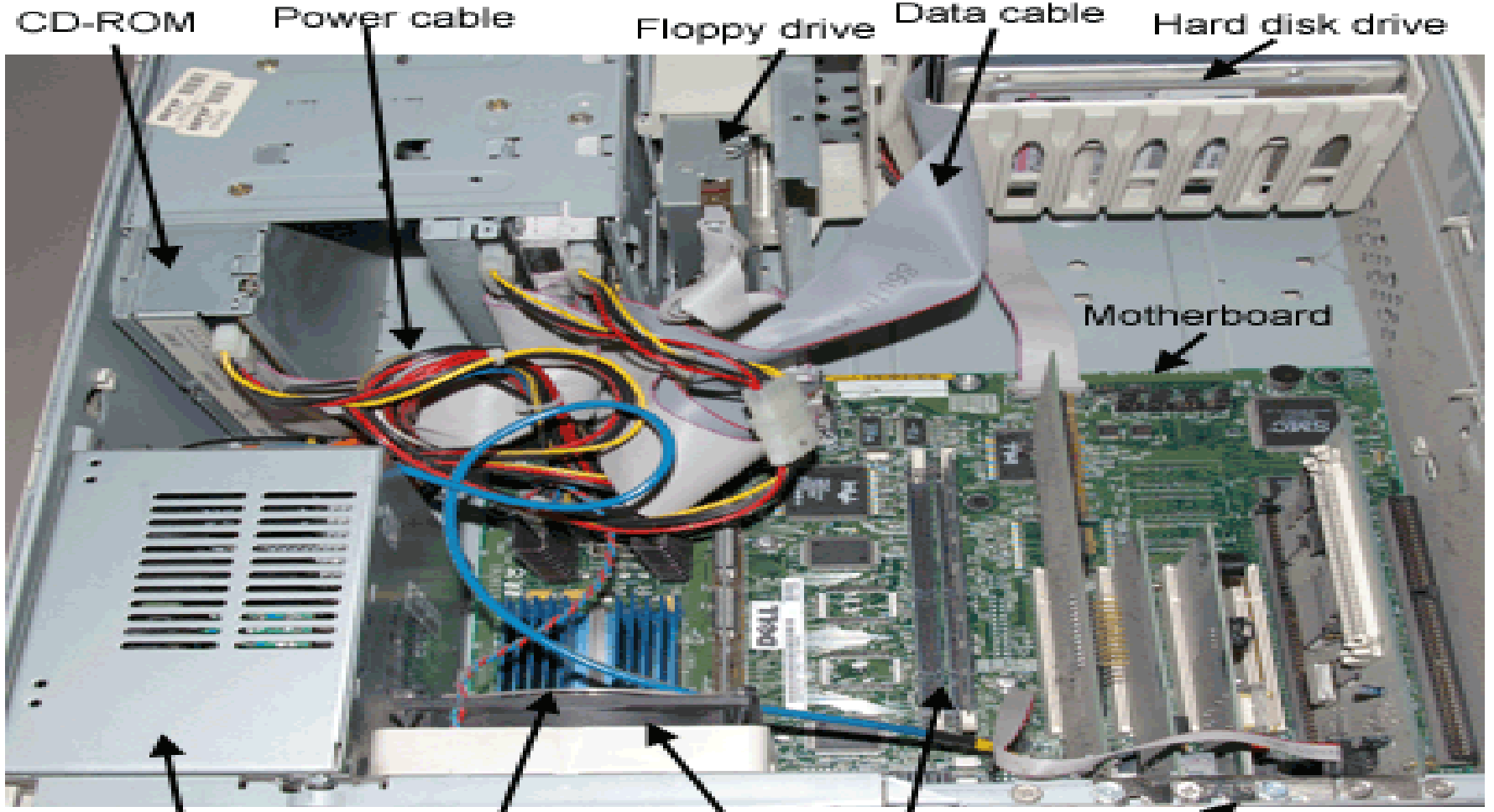

পাওয়ার সাপ্লাই

মাদার বোর্ডে যুক্ত থাকে যা কেসিং এর সাথেই সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। এটি প্রাপ্ত AC current কে DC current এ পরিণত করে এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। একি সাথে কম্পিউটারের সাথে সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্টগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহ করা ভোল্টেজকে রেগুলেট করে থাকে।

কম্পিউটার পেরিফেরাল

কম্পিউটার পেরিফেরাল বলতে ঐ সকল হার্ডওয়্যারকে বোঝায় যেগুলো কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থেকে কম্পিউটারের কার্যপরিধি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

কম্পিউটার পেরিফেরালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়-

- Input Peripheral
- Output Peripheral
- Input-Output Peripheral

কম্পিউটার এর কিছু ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস

ইনপুট ডিভাইস (গ্রহণমুখ যন্ত্র)

কম্পিউটারে কাজ করার জন্য যে সকল তথ্য প্রদান করা হয় তাদের বলা হয় ইনপুট। কম্পিউটারে ইনপুট প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এসকল যন্ত্রকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস। যেমনঃ কিবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, মাইক্রোফোন, জয়স্টিক, গ্রাফিক্স ট্যাবলেট, ওয়েবক্যাম, ডিজিটাল ক্যামেরা, MICR-রিডার, ওএমআর, ওসিআর, বারকোড রিডার ইত্যাদি।

কিবোর্ড

কিবোর্ড ইংরেজি শব্দ key board থেকে এসেছে, যা এখন প্রায় বাংলা একটি শব্দ। কতগুলো কি একত্রে একটি ধারকের মধ্যে থাকায় এইরূপ নামকরণ। কম্পিউটারের কিবোর্ড হল একটি টাইপরাইটার যন্ত্র বিশেষ যার মধ্যে কতগুলো বাটন বা চাবির সন্নিবেশ থাকে এবং এগুলো ইলেক্ট্রনিক সুইচ এর কাজ করে। বর্তমানে প্রচলিত কিবোর্ডগুলোতে ১০৫-১১০ টি কি থাকে।

কিবোর্ড

কিবোর্ডে বিভিন্ন ধরণের কি থাকে-

১. **ফাংশন কিঃ** তথ্য সংযোজন, বিয়োজন বা নির্দেশ প্রদানের জন্য ফাংশন কি ব্যবহার করা হয়। F1-F12 পর্যন্ত মোট ১২ টি ফাংশন কি রয়েছে।

২. **আলফানিউমেরিক কিঃ** কিবোর্ডে অ্যালফাবেট (a-z) এবং নম্বর (0-9) দিয়ে সাজানো কি গুলোকে বলা হয় আলফানিউমেরিক কি।

৩. **নিউমেরিক কি-প্যাডঃ** কিবোর্ডের ডান অংশে ক্যালকুলেটরের মতো অর্থাৎ 0-9 এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি চিহ্নিত কিগুলোকে নিউমেরিক কি-প্যাড বলা হয়। ১৭ টি নিউমেরিক কি রয়েছে।

কিবোর্ড

৪. স্পেশাল কি বা মডিফাইয়ার কিঃ কিবোর্ডের যে সকল বোতামে কোন অক্ষর বা বর্ণ টাইপ করা থাকেনা কিন্তু অক্ষর বা বর্ণ বিন্যাসের কাজ এবং অন্যান্য ধরণের কাজ
করা হয় সেগুলোকে বলা হয় মডিফাইয়ার কি। এরা হলো Shift, Option, Command, Ctrl, Alt ইত্যাদি

৫. কার্সর মুভমেন্ট কিঃ কিবোর্ডের ডান দিকে চারটি Arrow Key আছে। এগুলোকে কার্সর মুভমেন্ট কি বলা হয়। কার্সর মুভমেন্ট কি ৪টি।

৬. কমান্ড কি: কমান্ড কি ৩টি। Shift, Ctrl, Alt

কিবোর্ড বিন্যাসঃ বিভিন্ন ধরণের কিবোর্ড লে-আউট আছে। কিবোর্ডের বাম প্রান্তের উপরের ছয়টি বর্ণের ক্রম দিয়ে এই লে-আউটের নামকরণ করা হয়। যেমনঃ QWERTY layout, QWERTZ layout, AZERTY layout.

অভ্র কিবোর্ডঃ অভ্র কিবোর্ড হল বাংলা লেখার একটি মুক্ত সফটওয়্যার। এতে ফোনেটিক পদ্ধতিতে বাংলা লেখা যায়। মেহেদি হাসান অভ্র কিবোর্ড উদ্ভাবন করেন।

মাউস

মাউস কম্পিউটার পরিচালনায় ব্যবহৃত একটি হার্ডওয়্যার। ১৯৬৩ সালে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডগলাস এঙ্গেলবার্ট সর্বপ্রথম মাউস আবিষ্কার করেন। কিন্তু সত্তরের দশকে এটি কেবল জেরক্সের কম্পিউটার ছাড়া অন্যত্র জনপ্রিয়তা পায় নাই। ১৯৮৪ সালে অ্যাপল কম্পিউটার তাদের ম্যাকিন্টশ সিরিজে প্রথম এটি উপস্থাপন করে, এর আকৃতি ইঁদুরের মত তাই এর নাম mouse দেয়া হয়েছিল। এটি একটি ইনপুট ডিভাইস, এর মাধ্যমে মনিটরের বা প্রোগ্রামের যে কোন স্থানে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এর কল্যাণে গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস বা GUI সম্বলিত আপারেটিং সিসটেম এত দ্রুত প্রসার পায়।

মাউস

এর সাহায্যে যে কাজগুলো করা যায়-

পয়েন্টিং: মাউস পয়েন্টকে মনিটর স্ক্রিনের যে কোন জায়গায় Move করানোকে পয়েন্টিং বলা হয়।

ক্লিকঃ মাউসের বাটনকে একবার ক্লিক করে ছেড়ে দেওয়াকে সিঙ্গেল ক্লিক বা শুধু ক্লিক বলা হয়।

ডাবল ক্লিকঃ মাউসের বাটন পরপর দুইবার চাপ দেওয়াকে ডাবল ক্লিক বলা হয়।

ড্র্যাগ এন্ড ড্রপঃ কোন ছবি, আইকন বা উইন্ডোকে সিলেক্ট করে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে টেনে আনাকে ড্র্যাগ বা ড্র্যাগিং বলে। এভাবে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দেওয়াকে ড্রপিং বা ড্রপ বলা হয়।

সিলেক্টঃ কোন অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হলে অবজেক্টের ডান বা বাম দিকে আই-বিম ক্লিক করে মাউসে চেপে রেখে অবজেক্টের উপর দিয়ে বাম বা ডানদিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এতে টেনে নিয়ে যাওয়া অংশটুকুর উপর অন্য রঙের আচ্ছন পড়ে যাবে। একেই সিলেক্ট বলা হয়।

মাইক্রোফোন

মাইক্রোফোন একটি ইনপুট ডিভাইস যা শব্দ রেকর্ডিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে শব্দ রেকর্ড হয় এবং ডিজিটাল ফরমেটে রুপান্তরের পর সাউন্ড ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

জয়স্টিক

জয়স্টিক হল একটি ইনপুট ডিভাইস যতে আয়তাকার বেসের উপর একটি দন্ড বসানো থাকে। বেসের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ থাকে। সাধারণত কম্পিউটারে গেম খেলতে জয়স্টিক ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ও বিভিন্ন ধরণের সিমুলেশনের কাজেও জয়স্টিক ব্যবহৃত হয়।

স্ক্যানার

স্ক্যানারের সাহায্যে যেকোনো ডকুমেন্টকে ইমেজ আকারে কম্পিউটারে সেভ করে যায়। স্ক্যানার বিভিন্ন ধরণের হয়; যেমন- Flatbed scanner, Handheld scanner, Drum scanner ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রধানত ফ্লাটবেড অপ্টিকাল স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়।

গ্রাফিক্স ট্যাবলেট

গ্রাফিক্স ট্যাবলেট কার্যত মাউসের বিকল্প যন্ত্র। গ্রাফিক্স ট্যাবলেট দেখতে অনেকটা পেন্সিলের স্লেটের মতো। বিশেষ কলম দিয়ে স্লেট বা প্যাডের উপরে ছবি বা কোন অলঙ্করণের কাজ করা যায়।

ওয়েবক্যাম

ওয়েবক্যাম হল একটি ভিডিও ক্যামেরা যা কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে রিয়েল টাইম ইমেজ বা ভিডিও আদানপ্রদান করে। এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে ভিডিও চ্যাটিং করা যায়, কম্পিউটার থেকে ভিডিও দেখে নিরাপত্তার কাজ করা যায় এবং ভিডিও রেকর্ডিং করা যায়।

ডিজিটাল ক্যামেরা

চলন্ত এবং স্থির ছবি তুলে তা কম্পিউটারে দেওয়ার জন্য ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল ক্যামেরাতে ফিল্ম থাকেনা। এতে CCD (Charge Coupled Device) নামক একটি চিপ থাকে।

ওএমআর

OMR বা Optical Mark Reader এমন এক যন্ত্র যা পেন্সিল বা কালির দাগ বুঝতে পারে। পেন্সিলের দাগ বোঝা যায় পেন্সিলের সীসার উপাদান গ্রাফাইটের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা যাচাই করে। কালির দাগ বোঝা যায় কালির দাগের আলোর প্রতিফলন বিচার করে। অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষা, বাজার সমীক্ষা, জনগণনা ইত্যাদি কাজে OMR ব্যবহৃত হয়।

ওসিআর

OCR বা Optical Character Reader/Recognition শুধু দাগই বোঝেনা, বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্যও বুঝতে পারে। চিঠির পিন কোড, ইলেকট্রিক বিল, ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম, নোটিশ ইত্যাদি পড়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

MICR-রিডার

MICR এর পূর্ণরূপ হল Magnetic Ink Character Recognition. যে মেশিন MICR লেখা পড়তে পারে তাকে MICR-রিডার বলে। চৌম্বক কালির সাহায্যে MICR লেখা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের চেক নাম্বার লেখা ও পড়া হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকে MICR যুক্ত চেক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বারকোড রিডার

বারকোড রিডার একটি অপটিক্যাল ইনপুট ডিভাইস। বারকোড বলতে কমবেশি চওড়াবিশিষ্ট পর্যায়ক্রমে কতগুলো বার বা রেখার সমাহারকে বোঝায়। একে ইউনিভার্সাল প্রোডাক্ট কোডও বলা হয়। দোকান থেকে বিক্রিত জিনিসের প্যাকেটের উপর বারকোডের সাহায্যে জিনিসের নাম, মূল্য ইত্যাদি লেখা থাকে। অতঃপর একটি কম্পিউটার বারকোড রিডারের সাহায্যে কোডটি পড়ে তা কোন সংখ্যা বোঝায়, তা জেনে নিতে পারে। কম্পিউটারের স্মৃতিতে প্রতিটি জিনিসের বারকোড নাম্বার ও দাম রক্ষিত থাকে। এ থেকে কম্পিউটার বিক্রিত জিনিসের নাম ও দাম রক্ষিত থাকে। এ থেকে কম্পিউটার বিক্রিত জিনিসের নাম ও দাম লিখে বিল তৈরি করে এবং সাথে সাথে বিক্রিত জিনিসের স্টক আপডেট করে।

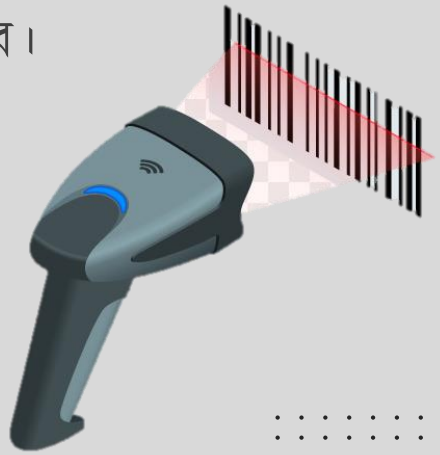

আউটপুট ডিভাইস (নির্গমমুখ যন্ত্র)

কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট প্রাপ্ত ইনপুটকে ব্যবহারকারীর দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হলে তার ফল পাওয়া যায়। একে বলে আউটপুট। প্রক্রিয়াকরণের পর যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে ফল পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস। যেমনঃ মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, প্রোজেক্টর, প্লটার, হেডফোন ইত্যাদি।

মনিটর

মনিটর এক ধরণের আউটপুট ডিভাইস যার মাধ্যমে টেলিভিশনের মতো লেখা বা ছবি দেখা যায়। মনিটর সাধারণত তিন ধরণের হয়ে থাকে-

১. সিআরটি মনিটর
২. এলসিডি মনিটর
৩. এলইডি মনিটর

সিআরটি মনিটর

এলসিডি মনিটর

এলইডি মনিটর

মনিটর

সিআরটি মনিটরঃ CRT এর পূর্ণরূপ হলো Cathode Ray Tube. ক্যাথোড রে টিউবযুক্ত মনিটরকে সিআরটি মনিটর বলা হয়। টিউবের ভেতর দিকে ফসফর নামক এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ থাকে। সাদাকালো সিআরটি মনিটরে একটি ইলেকট্রন গান থাকে এবং রঙিন মনিটরে তিনটি মৌলিক রঙ (লাল, সবুজ, আসমানি) প্রদর্শনের জন্য তিন ধরণের ইলেকট্রন গান থাকে। আকারে অপেক্ষকৃত বড় এবং বিদ্যুৎ খরচ বেশী হওয়ায় মনিটরগুলোর ব্যবহার দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে।

এলসিডি মনিটরঃ LCD এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Liquid Crystal Display. কম্পিউটারে ব্যবহৃত এক ধরণের ডিসপ্লে ইউনিট। একে ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটরও বলা হয়। ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ল্যাপটপ কিংবা নোটবুকে এ ধরণের মনিটর ব্যবহৃত হয়।

মনিটর

এলইডি মনিটরঃ LED এর পূর্ণ রূপ হলো Light Emitting Diode. এটি LCD মনিটরের মতোই কাজ করে কিন্তু এর ব্যাকলাইট ভিন্ন ধরণের। LCD মনিটর অপেক্ষা ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভালো মানের এবং বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম। তৈরি করার সময় LCD মনিটরের মতো মারকারি ব্যবহার করা হয় না বলে এটি বেশী পরিবেশবান্ধব।

মনিটরের পর্দায় কোনো ছবি বা লেখা বা টেক্সট প্রদর্শনের জন্য কম্পিউটার একটি ইন্টারফেস ব্যবহার করে যাকে ভিডিও কন্ট্রোলার বলে। যেমন- VGA (Video Graphics Array), SVGA (Super VGA), XVA (Extended Graphics Array) ইত্যাদি।

প্রিন্টার

যে যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারে প্রাপ্ত ফলাফল কাগজে ছাপানো যায়, তাকে প্রিন্টার বলা হয়। প্রিন্টারের মান কি রকম হবে তা নির্ভর করে প্রিন্টারের রেজুলেশনের উপর। প্রিন্টারের রেজুলেশন পরিমাপের একক DPI. DPI এর পূর্ণরূপ হল Dots Per Inch. কার্যপ্রণালী অনুসারে প্রিন্টারকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়-

১. ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার

২. নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার

প্রিন্টার

১. ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারঃ যে প্রিন্টারে প্রিন্টহেড যে কাগজে ছাপা হয় তাকে স্পর্শ করে, তাকে ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার বলা হয়। ধীরগতি সম্পন্ন এ সকল প্রিন্টারের ছাপা সাধারণ মানের এবং প্রিন্ট এর সময় বিরক্তিকর শব্দ হয়। একে দু'ভাগে ভাগ করা হয়-

ক) **লাইন প্রিন্টারঃ** লাইন প্রিন্টারে প্রতিবারে একটি সম্পূর্ণ লাইন ছাপা হয়। এগুলো ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতির। লাইন প্রিন্টার প্রতি মিনিটে ২০০ থেকে ৩০০০ লাইন ছাপাতে পারে। লাইন প্রিন্টারকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়- চেইন প্রিন্টার ও ড্রাম প্রিন্টার।

খ) **সিরিয়াল প্রিন্টারঃ** সিরিয়াল প্রিন্টার টাইপ রাইটারের মতো একবারে মাত্র একটি বর্ণ ছাপা হয়। এগুলো ধীরগতি সম্পন্ন।

প্রিন্টার

সিরিয়াল প্রিন্টারকে দুইভাগে ভাগ করা হয়-

i) ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারঃ আয়তাকারে সাজানো কতকগুলো বিন্দুকে ডট ম্যাট্রিক্স বলে। যেমনঃ বিন্দুগুলো ৮টি সারি ও এবং ১২টি স্তম্ভে সাজানো থাকলে তাকে বলে ৮X১২ ডট ম্যাট্রিক্স। এই বিন্দুগুলোর মধ্যে কিছু বিন্দু নির্বাচন করে যে কোন বর্ণ ফুটিয়ে তোলা যায়। ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে লেখার জন্য ছোট পিনে গ্রিড ব্যবহার করা হয়। অনেকগুলো পিনের মাথা রিবনের উপর আঘাত করে কাগজের উপর বিন্দু বসিয়ে অক্ষর তৈরি করা হয়। সাধারণত এই প্রিন্টারে ৭, ৯ অথবা ২৪ পিন থাকে, যেগুলো লাইন বরাবর চলাচল করে বিন্দুর মাধ্যমে অক্ষর তৈরি করে। এ প্রিন্টারে ছাপা অক্ষর বা প্রতীক সূক্ষ্ম হয় না। এর গতি পরিমাপ একক cps (characters per second). এটি প্রথম দিকের প্রিন্টার এবং এর ছাপার ব্যয় অনেক কম, তবে গতি অন্ত্যন্ত ধীর।

প্রিন্টার

ii) ডেইজি হুইল প্রিন্টারঃ ডেইজি হুইল প্রিন্টারে একটি চ্যাপ্টা চাকার সঙ্গে সাইকেলের স্পোকের মতো অনেকগুলো স্পোক লাগানো থাকে। প্রতিটি স্পোকের মাথায় একটি বর্ণ এমব্রস করা থাকে। স্পোকগুলোসহ চাকাকে একটি ডেইজি ফুলের মতো দেখতে বলে এর এই নাম।

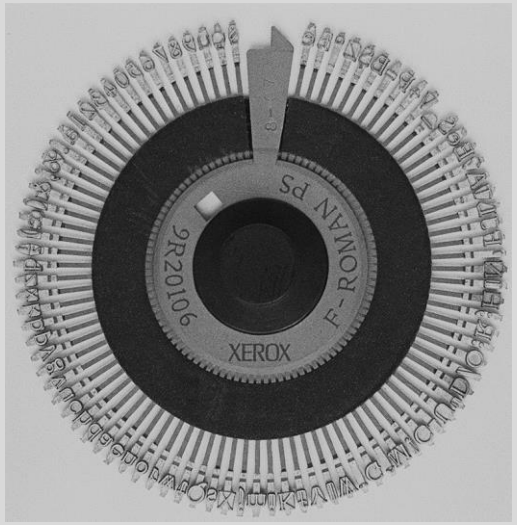

প্রিন্টার

২. নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারঃ যে প্রিন্টারে প্রিন্টহেড যে কাগজে ছাপা হয় তাকে স্পর্শ করেনা তাকে নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্তার বলা হয়। উচ্চগতিসম্পন্ন এ সকল প্রিন্টারের ছাপা উচ্চমানের এবং প্রিন্ট এর সময় কোন বিরক্তিকর শব্দ হয় না। যেমনঃ ইংকজেট প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার ইত্যাদি।

ইঙ্কজেট প্রিন্টারঃ ইঙ্কজেট প্রিন্টারে কতগুলো নোজল দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত তরল কালি কাগজের দিকে স্প্রে করা হয়। একটি তড়িৎক্ষেত্র এ চার্জযুক্ত কালির সূক্ষ্মকণাগুলোকে ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে কাগজের উপর কোন বর্ণ ফুটিয়ে তোলে। যেমনঃ Cannon Bubble jet, HP Deskjet, Epson Stylus ইত্যাদি।

লেজার প্রিন্টারঃ লেজার প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলা হয়। লেজার প্রিন্টার মুদ্রণের জন্য লেজার রশ্মি একটি আলোক সংবেদনশীল ড্রামের উপর মুদ্রণযোগ্য বিষয়ের ছাপা তৈরি করে। তখন লেজার রশ্মির প্রক্ষেপিত অংশ টোনার আকর্ষণ করে। কাগজের উপর পতিত টোনার উচ্চতাপে গলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসে যায়।এভাবে লেজার প্রিন্টারে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়। একে পেজ প্রিন্টারও বলা হয়। যেমনঃ HP Laserjet, Samsung ML-2010, Canon LBP 3500 ইত্যাদি।

- স্পিকার (সাউন্ড কার্ড হতে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করে)

- হেডফোন

- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (একটি ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল যন্ত্র) - এটি কম্পিউটার/অন্য কোনো উৎস থেকে নেওয়া ডেটাকে ইমেজে পরিণত করে। এই ইমেজ লেন্স এর সাহায্যে দূরবর্তী সাদা স্ক্রিনে বা দেয়ালে ফেলা হয়। বিশাল সভাকক্ষে ব্যভারের জন্য এর ল্যাম্পের ঔজ্জ্বল্য এক হাজার থেকে চার হাজার লুমেন্স এর হতে হয়। এলসিডি প্রজেক্টরগুলোর ল্যাম্প চার হাজার ঘন্টা পর পরিবর্তন করতে হয়। এলইডি এর ল্যাম্প বিশ হাজার ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারে।)

- কাইনেটিক সেনসর, Gesture recognition – যারা বিভিন্ন Motion বা অঙ্গভঙ্গি থেকে ইনপুট নিয়ে থাকে।
- প্লটার- এটি এক ধরণের প্রিন্টার যার সাহায্যে ছবি বা গ্রাফ আউটপুট করা হয়। প্লটার দুই ধরণের – ফ্লাট বেড প্লটার ও ড্রাম প্লটার।

- VDU – Visual Display Unit

ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

একি সাথে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

- **সাউন্ড কার্ডঃ** ডিজিটাল উপাত্তকে এনালগ শব্দে রূপান্তর করে। আউটপুট সিগন্যালগুলোকে একটি অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে যুক্ত করে হেডফোন বা স্পিকারের সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। বাইরে থেকে মাইক্রোফোন বা অন্য কোনো ইনপুট যন্ত্র দিয়ে শব্দ এলে সাউন্ড কার্ড তা প্রসেসরে পাঠায় এবং প্রসেসর সেই ইনপুটকে প্রক্রিয়া করে আবার সাউন্ড কার্ডে পাঠায়, সেখান থেকে হেডফোন বা স্পিকারের মাধ্যমে আমরা শুনতে পাই)।
- **গ্রাফিক্স কার্ড** (গ্রাফিক্স কার্ডে ইনপুট ও আউটপুট কানেক্টর থাকে)
- **টাচস্ক্রিন মনিটর/ডিসপ্লে**
- **মডেম** (ডাউনলোড এবং আপলোড উভয়ই করে)

মেমোরি এবং স্টোরেজ ডিভাইস

মাইক্রো প্রসেসস নির্ভর সকল পণ্যেই স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মেমোরি দুই প্রকার – প্রধান মেমোরি ও সহকারী মেমোরি ।

বিট, বাইট এবং শব্দ দৈর্ঘ্য

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বা দ্বিমিক সংখ্যা পদ্ধতি (ইংরেজি: Binary number system) একটি সংখ্যা পদ্ধতি যাতে সকল সংখ্যাকে কেবলমাত্র ০ এবং ১ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি দুই। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির লজিক গেটে এই সংখ্যাপদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। সকল আধুনিক কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটার সমস্ত হিসাব নিকাশ ০ ও ১ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে। তাই কম্পিউটারে প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশ টেলেক্স কোডকে প্রথমে বাইনারি অঙ্কে রূপান্তর করে তার পর হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করে ।

মেমোরি এবং স্টোরেজ ডিভাইস

বিটঃ বাইনারি নাম্বার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ০ এবং ১ এর অংক দুটটির প্রত্যেকটিকে একটি বিট বলা হয়। ইংরেজি binary শব্দের Bi এবং Digit শব্দের t নিয়ে বিট Bit শব্দটি গঠিত। যেমনঃ ১০১০১ সংখ্যাটিতে পাঁচটি বিট আছে। কম্পিউটারের স্মৃতিতে ০ এবং ১ এর কোড দিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষিত থাকে। এজন্য কম্পিউটারের স্মৃতির ধারণক্ষমতা পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে বিট শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বাইটঃ ৮ বিটের কোড দিয়ে যে কোন বর্ণ, অংক বা বিশেষ চিহ্নকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ৮টি বিট দিয়ে গঠিত শব্দকে Byte বলা হয়। যেমনঃ ১০০০১০১০ হল ১টি বাইট। বাইট হলো বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক। কম্পিউটারে স্মৃতি ধারণক্ষমতা বাইটে প্রকাশ করা হয়।

শব্দ দৈর্ঘ্যঃ কম্পিউটারে সকল শব্দই থাকে ০ বা ১ বিট হিসেবে। ৮ বিট বিশিষ্ট শব্দকে বাইট বলা হয়। কোন শব্দে যতগুলো বিট থাকে সেই সংখ্যাকে বলে শব্দ দৈর্ঘ্য। সাধারণত শব্দ দৈর্ঘ্য ৮ গুনিতকে ৮ থেকে ৬৪ বিটে হয়।

মেমোরির ধারণক্ষমতা

মেমোরির ধারণক্ষমতাঃ কম্পিউটার মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণের পরিমাণকে মেমোরির ধারণক্ষমতা বলে। একে প্রকাশ করা হয় বাইট, কিলোবাইট, মেগাবাইট, গিগাবাইট ইত্যাদি দ্বারা।

১ বাইট = ৮ বিট

১ কিলোবাইট = ১০২৪ বাইট

১ মেগাবাইট = ১০২৪ কিলোবাইট

১ গিগাবাইট = ১০২৪ মেগাবাইট

১ টেরাবাইট = ১০২৪ গিগাবাইট

১ পিটাবাইট = ১০২৪ টেরাবাইট

মেমোরি অ্যাড্রেস

ডেটা রাখার জন্য মেমোরিতে অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট স্থান বা সেল থাকে এবং স্থান বা সেলগুলো সনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকে। একে মেমোরি অ্যাড্রেস বলে। অ্যাড্রেস রেজিস্টারে n টি বিট জমা থাকলে তার সাহায্যে $2n$ টি অ্যাড্রেস রাখা যায়।

প্রধান মেমোরি

প্রধান মেমোরি এবং তার প্রকারভেদঃ যে মেমোরি সিপিইউ এর গাণিতিক ও যুক্তি অংশের সাথে সংযুক্ত তাকে প্রধান মেমোরি (Main Memory) বলা হয়। প্রধান মেমোরিকে প্রাথমিক মেমোরি (Primary Memory হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটারে অর্ধপরিবাহী মেমোরি (Semiconductor Memory) ব্যবহার করা হয়। অর্ধপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি বলেই একে অর্ধপরিবাহী মেমোরি বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত এ অর্ধপরিবাহী মেমোরি দুইপ্রকার- র‍্যাম (Random Access Memory) এবং রম (Read Only Memory).

RAM

মাদারবোর্ডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত যে মেমোরিতে Read এবং Write দুটি কাজই সম্পন্ন করা যায়, সে মেমোরিকে RAM (Random Access Memory) বলা হয়। এটি একটি অস্থায়ী মেমোরি। কম্পিউটারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু থাকে , ততক্ষণ RAM এ তথ্যসমূহ সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে RAM তার সমস্ত তথ্য মুছে ফেলে। এজন্য RAM কে কম্পিউটারের অস্থায়ী (Volatile) মেমোরিও বলা হয়। এছাড়া RAM কে মেইন স্টোরেজ (Main Sotrage) এবং কোর স্টোরেজ (Core Storage) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। RAM হচ্ছে কম্পিউটারের কর্ম এলাকা। মাইক্রোপ্রসেসর প্রাথমিকভাবে র‍্যাম এলাকায় প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করে। মাইক্রোপ্রসেসর সরাসরি RAM র জন্য জানা অবস্থান বা ঠিকানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বা তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে। এখানে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের জন্য যাওয়া যায় বলে একে Random Access Memory বলা হয়। বিদ্যুৎ চলে গেলে র‍্যাম তথ্য শূণ্য হয়ে যায়।

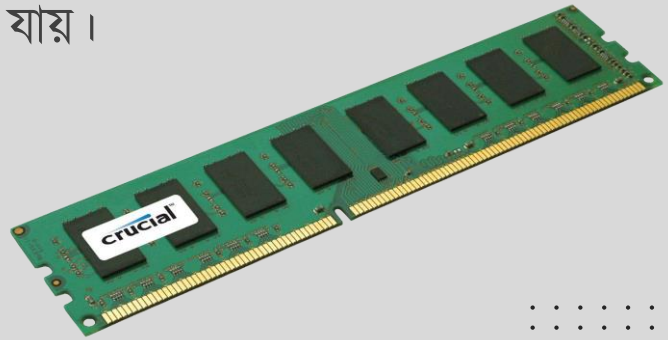

ROM

ROM (Read Only Memory) স্থায়ী প্রকৃতির প্রধান মেমোরি। রমের স্মৃতিতে রক্ষিত তথ্যসমূহ কেবল ব্যবহার করা যায় কিন্তু সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। তাই একে Read Only Memory বলা হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রমে রক্ষিত তথ্য মুছে যায় না।

রমের প্রকারভেদঃ

ক) এম.রম (MROM= Mask Read Only Memory)

খ) পিরম বা প্রম (PROM= Progammable Read Only Memory)

গ) ইপ্রম (EPROM= Eraseable Programmable Read Only Memory)

ঘ) ইইপ্রম (EEPROM= Electrically Eraseable PROM)

ঙ) ইএপ্রম (EAPROM= Electrically Alterable PROM)

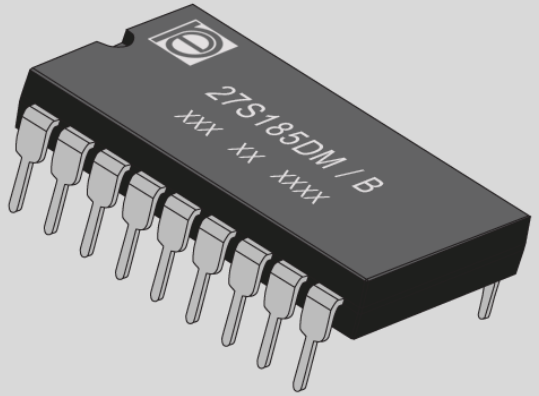

Secondary Memory Devices

কম্পিউটারের যে মেমোরি এর সিপিইউ অংশের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে না তাকে সহায়ক মেমোরি বলে। এতে তথ্য স্থায়ীভাবে থাকে, বিদ্যুৎ চলে গেলে তথ্য চলে যায় না তবে চাইলে ডিলেট করে ফেলা যায় যেকোনো তথ্য। এর ধারণক্ষমতা প্রাইমারী মেমোরি থেকে অনেক বেশি, কিন্তু ধীর গতি সম্পন্ন।

হার্ডডিস্ক

- তথ্য সংরক্ষণের প্রধান যন্ত্র। IBM কোম্পানী ১৯৫৬ সালে মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য প্রথম হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করেন।
- ১৯৮০ সালে ১ গিগাবাইট তথ্য ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি হার্ডডিস্ক এর আকার ছিলো একটি রেফ্রিজারেটরের সমান।
- হার্ডডিস্ক এ কতগুলো চাকতি থাকে যাদের প্লটার বলা হয়। প্লটারগুলো অ্যালুমিনিয়াম এলয়/ কাঁচ/ সিরামিকের চাকতির উপর পাতলা চুম্বকীয় পদার্থের আস্তরণ দিয়ে তৈরি।
- হার্ড ডিস্ক দুই ধরণের – Internal HDD & External HDD
- হার্ড ডিস্ক এর প্রতিটি সেক্টরের ধারণ ক্ষমতা ৫১২ বাইট। হার্ড ডিস্ক মাপার একক গিগাবাইট বা টেরাবাইট।

CD/DVD

এদের নিচের দিকে পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত থাকে যা দুইপাশে পলিকার্বনেট প্লাস্টিক দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।
সিডি বা ডিভিডিতে তথ্য রাখা বা পাঠ করতে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়।
বর্তমানে ব্লু-রে ডিস্কে প্রচলিত ডিভিডি থেকে কয়েকগুণ বেশি তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায়। ডিস্ক এর ভেতরের Concentric Ring আকারে যেসব Magnetic Bits সজ্জিত থাকে তাদেরকে ট্র্যাকস বলে।

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ

পেনড্রাইভ সরাসরি USB দিয়ে সংযুক্ত করা যায় কিন্তু মেমোরি কার্ড সংযোগের জন্য কার্ড রিডার প্রয়োজন।

WORM

WORM (Write Once Read Memory) – একবারই মাত্র রেকর্ড করা সম্ভব।

ক্যাশ (Cache) মেমোরি

মাইক্রোপ্রসেসর ও প্রধান স্মৃতির মাঝে যে অতি উচ্চ গতির এবং কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মেমোরি ব্যবহার করা হয় তাকে ক্যাশ মেমোরি বলে। এটি এক ধরণের স্ট্যাটিক মেমোরি। এটি কম্পিউটারের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম, উচ্চগতির মেমোরি যার আকার ২৫৬ কিলোবাইট থেকে কয়েক মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

যে মেমোরি বিদ্যুৎ চলে গেলে মুছে যায় তাকে Volatile memory বলে।

যে মেমোরি বিদ্যুৎ চলে গেলে মুছে যায় না তাকে Non-volatile memory বলে।

কম্পিউটার বাস

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারগুলোর তথ্য পরিবাহী যোগাযোগ রক্ষার জন্য এক ধরনের ধাতব পরিবাহী লাইন বা তার ব্যবহৃত হয়, এগুলো বাস। অর্থাৎ বাস হচ্ছে একগুচ্ছ তার যার মধ্যে দিয়ে ডিজিটাল সংকেত ১ বা ০ চলাচল করতে পারে।

কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তথ্য পরিবহনের জন্য পরিবাহী পথকে বাস বলা হয়।

মেমোরি থেকে প্রসেসরে, প্রসেসর থেকে মেমোরিতে ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস এবং অন্যান্য অংশে বাসের মাধ্যমে ডিজিটাল সংকেত ১ বা ০ বিট চলাচল করে। কোন বাসের একটি লাইন দিয়ে একসাথে একাধিক ডিজিটাল সংকেত চলাচল করতে পারে না।

কম্পিউটার বাস

একটি বাসের ক্ষমতা বা প্রশস্ততা (Bus width) নির্ভর করে ঐ বাসের ভিতর দিয়ে একক সময়ে কতগুলো বিট চলাচল করতে পারে। কম্পিউটার বাসের প্রশস্ততা মাপা হয় বিট দিয়ে। বাসের গতি মাপা হয় মেগাহার্টসে। ১৬ বিটের ডেটাবেস হলো ঐ বাসের ভিতর দিয়ে একক সময়ে ১৬টি বিট চলাচল করতে পারে।

বাস তার গুচ্ছ-এর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে প্রসেসরের ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়।

কম্পিউটার বাসকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সিস্টেম বাস

২. এক্সপানশন বাস

সিস্টেম বাস

এই বাস সিপিইউ বা মাইক্রোপ্রেসেসরের সাথে কম্পিউটারের অন্যান্য। অংশকে সরাসরি সংযুক্ত করে। এই বাসের সাহায্যে সিপিইউ মেমোরি এবং অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সিস্টেম বাসকে ইন্টার্নাল বাসও বলা হয়।

ক. ডেটা বাস :

ডেটা বাস হচ্ছে ইনপুট/আউপুটের সার্কিট থেকে বেরিয়ে আসা একগুচ্ছ তার। ডেটা বাস-এর কাজ হলো বিভিন্ন চিপের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান করা। এটি উপাত্ত গ্রহণ ও নির্গমণের কাজে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কম্পিউটারে ডেটা বাসের মাধ্যমে ইনপুট ডিভাইস বা রম/র্যাম স্মৃতি থেকে সিপিইউ তথ্য পড়ে এবং সিপিইউ আউটপুট ডিভাইস বা র্যামএর তথ্য প্রেরণ করে। একে দ্বিমুখী বাস বলে ।

সিস্টেম বাস

ডেটা বাস ৮ বিট, ১৬ বিট, ৩২ বিট, ৬৪ বিট বা তারও বেশি ক্ষমতার হতে পারে।

ডেটা বাসের উপর ভিত্তি করে প্রসেসরকে চার ভাগে ভাগ করা হয় ।

8-bit Microprocessor : এ ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর ৮ বিট (১ বাইট) এককে তথ্য পরিবহন করে।

16-bit Microprocessor : এ ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর ১৬ বিট (২ বাইট) এককে তথ্য পরিবহন করে।

32-bit Microprocessor: এ ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর ৩২ বিট (৪ বাইট) এককে তথ্য পরিবহন করে। ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেম হলো: Windows 98, OS/2, UNIX.

64-bit Microprocessor : এ ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর ৬৩ বিট (৮ বাইট) এককে তথ্য পরিবহন করে। ইনটেল ITANIUM একটি ৬৪ বিট মাইক্রোপ্রসেসর।

সিস্টেম বাস

খ. Address BUS

অ্যাড্রেস বাসের সাহায্যে সিপিইউ মেমোরি কোন বিশেষ ঠিকানার সাথে সংযোগ স্থাপন করে। অ্যাড্রেস বাস একমুখী। অ্যাড্রেস বাসে ৮, ১২ বা তারও বেশি বিটের তার থাকে। অ্যাড্রেস বাস এর সাহায্যে ডাটা আসা-যাওয়া করে না, মেমোরি আসা-যাওয়া করে।

গ. কন্ট্রোল বাস

কন্ট্রোল বাস মাধ্যমে সিপিইউ থেকে নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। মেমোরির ত্রুটিজনিত সমস্যার সমাধান নিরূপণে এই বাস ব্যবহৃত হয়। এটি উভমুখী বাস। এর সাহায্যে সিপিইউ যে অ্যাড্রেসে রয়েছে সেখানে মেমোরি পড়া, লেখা বা ইনপুট- আউটপুট নির্দেশ প্রেরণ করা যায় ।

এক্সপানশন বাস

কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এক্সপানশান বাস আবিষ্কৃত হয়েছে। সিপিইউ এক্সপানশন বাসের সাহায্যে কম্পিউটারের ইনপুট-আউটপুট ও অন্যান্য পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করে। মাদারবোর্ডের প্রসেসর থেকে এ সকল এক্সপানশন স্লট বাস দ্বারা সংযোগ করা থাকে।

উল্লেখযোগ্য এক্সপানশন বাস :

লোকাল বাস :

যে সব বাস প্রধান বাসের তথ্য পরিবহনের চাপ কমিয়ে কম্পিউটারকে। দ্রুত গতিতে কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দেয় তাদের লোকাল বাস বলে।

এক্সপানশন বাস

VESA বাস :

VESA এর পূর্ণরূপ Video Electronic Standard Association, ভিসা বাস ৩২ সিপিইউ গতিতে তথ্য বহন করতে পারে। এ বাস সিপিইউ এর নিয়ন্ত্রণে সিপিইউ এর সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে কাজ করে। গ্রাফিক্স কাজের জন্য এটি বেশি প্রয়োজন হয়।

পিসিআই বাস :

PCI এর পূর্ণরূপ Peripheral Component Interconnect। PCI বাসও VESA বাসের মত ৩২ বিটের লোকাল বাস, তবে PCI BUS অনেক বেশি দক্ষ । বর্তমানে একে ৬৪ বিট বা ১২৮ বিটের উপযোগী করা হয়েছে। মাদারবোর্ডে পিসিআই বাস ৩২ বিটে কাজ করে।

এক্সপানশন বাস

খ. USB বাস :

USB এর পূর্ণরূপ Universal Serial Bus. ১৯৯৮ সাল থেকে ইন্টেল মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটারগুলোতে এই বাস ব্যবহার করা হচ্ছে। ইনটেল মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটারে এর ব্যবহার অত্যধিক। এখন ইউএসবি এর ভিত্তিতে মাউস, বোর্ড, স্ক্যানার, হার্ডডিস্ক ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে।

গ. ফায়ারওয়্যার :

ফায়ারওয়ার হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতির বাস, এ যাবতকালের তৈরি । সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতির বাস। এ বাসের নাম হচ্ছে IEEE 1984। এতে প্রতি সেকেন্ডে ১০০, ২০০ বা ৪০০ মেগাবাইট ডেটা স্থানান্তর সম্ভব।

এক্সপানশন বাস

ঘ. এজিপি :

এজিপি এর পূর্ণরূপ Accelerated Graphics Port. মাদারবোর্ডে এজিপি কার্ড স্থাপনের জন্য একটি মাত্র এজিপি স্লট থাকে। ভিডিও, গেমস, গ্রাফিক্স ইত্যাদি প্রদর্শনের জন্য এই বাস ব্যবহার করা হয়।

ঙ. আইএসএ বাস :

ISA এর পূর্ণরূপ Industry Standard Architecture । এটি ধীরগতি সম্পন্ন বাস। ১৯৮১ সালে IBM ইন্টেলের ৮০৮৮ প্রসসরে। ISA বাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তখন এটি ছিলো ৮ বিট ডেটা বাস। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ৮ বিট ISA বাসকে উন্নত করে ১৬ বিট ISA বাসে রূপান্তর করে।

চ. EISA বাস :

EISA এর পূর্ণরূপ Extended Industry Standard Architecture। ১৬ বিটের ISA বাসের বর্ধিত সুবিধা যোগ করে ৩২ বিটের EISA বাস তৈরি করা হয়।

পোর্ট (Port)

কম্পিউটারে পোর্ট হলো এক ধরনের পয়েন্ট বা সংযোগমুখ। কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের সাথে কী-বোর্ড, মাউস, স্পিকার, স্ক্যানার ইত্যাদি যন্ত্রের সংযোগ পয়েন্ট থাকে। এই সংযোগ পয়েন্টকে বলা হয় পোর্ট। এসমস্ত সংযোগ সাধারণত প্লাগ যুক্ত ক্যাবলের সাহায্যে সিপিইউ বক্সের পিছনে দেওয়া হয়।

যে প্লাগে পিন লাগানো থাকে তাকে বলে মেল প্লাগ (Male plug) এবং যে প্লাগে ছিদ্র থাকে তাকে বলা হয় ফিমেল প্লাগ (Female plug)। কম্পিউটারে পোর্টের মধ্যে দিয়ে ডেটা চলাচল করতে পারে।।

পোর্ট (Port)

সংযোগের প্রকৃতি অনুসারে পোর্ট বিভিন্ন ধরনের :

১. প্যারালাল পোর্ট,
২. সিরিয়াল পোর্ট,
৩. ইউএসবি পোর্ট,
৪. মনিটর পোর্ট,
৫. কী-বোর্ড পোর্ট,
৬. নেটওয়ার্কিং পোর্ট,
৭. অডিও পোর্ট,
৮, ভিডিও পোর্ট,
৯. গেম পোর্ট
১০. মাউস পোর্ট ইত্যাদি।

পোর্ট (Port)

১. প্যারালাল পোর্ট :

যে সমস্ত পোর্টে তথ্য সমান্তরালভাবে আদান-প্রদান করতে পারে তাকে প্যারালাল পোর্ট বলে। যেমন - ৮ বিটের একটি তথ্য প্যারালাল পোর্টের ভিতর দিয়ে একত্রে চলাচল করতে পারে। পার্সোনাল কম্পিউটারে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট। দ্রুতগতি এবং সহজ ব্যবহারের জন্য এই পোর্টের সূচনা হয় প্রিন্টার ব্যবহারের জন্য । এই জন্য এর নাম হয় প্রিন্টার পোর্ট। এর লজিক্যাল নাম LPT (Line Print Terminal)। এই ধরনের পোর্টে তিনটি পৃথক রেজিস্টার থাকে। যথা-

- ডেটা রেজিস্টার ;
- স্ট্যাটাস রেজিস্টার ;
- কন্ট্রোল রেজিস্টার ।

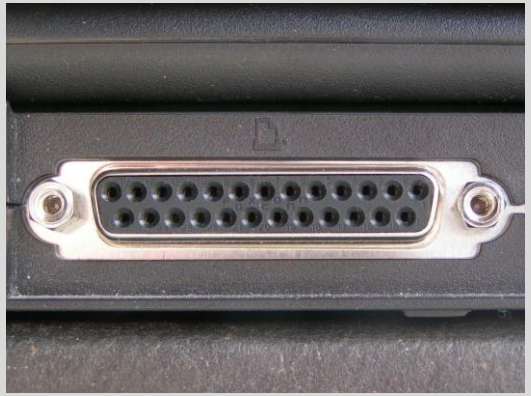

পোর্ট (Port)

২. সিরিয়াল পোর্ট :

যে পোর্টের মধ্য দিয়ে ডেটাসমূহ এক বিট এক বিট করে চলাচল করতে পারে তাকে সিরিয়াল পোর্ট বলে। যেমন - ৮ বিটের একটি তথ্য সিরিয়াল পোর্টের ভিতর দিয়ে এক বিট করে চলাচল করতে পারে। এটি কম্পিউটারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট। প্যারালাল পোর্টের তুলনায় এই পোর্টে ডেটা চলাচলের গতি কম। এই পোর্টে সাধারণত মাউস, কী-বোর্ড, মডেম যুক্ত থাকে। যে সব ডিভাইসের মধ্য দিয়ে ডেটাসমূহ সিরিয়াল পদ্ধতিতে চলাচল করে তাকে সিরিয়াল কমিউনিকেশন ডিভাইস বলে। যেমন- কী-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি। আই.বি.এম. কম্প্যাটেবল কম্পিউটারে ২৫-পিন অথবা ৯-পিন-এর ডি-টাইপ কানেক্টর ব্যবহৃত হয়।

পোর্ট (Port)

৩. ইউএসবি পোর্ট :

U.S.B. Port-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Universal Serial Busport সিস্টেম ইউনিটের সাথে ইউএসবি বাস ও ইউএসবি সাপোর্টেড ডিভাইসসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাদার বোর্ডের সাথে যে পোর্ট ব্যবহার করা হয় তাকে ইউএসবি পোর্ট বলা হয় ।

৪. মনিটর পোর্ট :

মনিটর পোর্টের সাহায্যে কম্পিউটারে সিপিইউ-এর সাথে মনিটর যুক্ত করা হয়। কম্পিউটার মাদারবোর্ডে একটি এক্সপানশন কার্ড বসিয়ে উক্ত স্লটে অবস্থিত পোর্টের মাধ্যমে মনিটরকে সংযোগ দেওয়া হয়। মনোক্রম মনিটরের জন্য ৯-পিন-এর পোর্ট ব্যবহৃত হয়। ভিজিএ মনিটরের সংযোগের ক্ষেত্রে ১৫-পিন-এর পোর্ট ব্যবহৃত হয়।

পোর্ট (Port)

৫. কী-বোর্ড পোর্ট :

সিস্টেম ইউনিটের পেছনের প্রান্তে ৫-পিন বিশিষ্ট DIN পোর্টের মাধ্যমে কী-বোর্ডকে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়।

বর্তমানে PS/2 টাইপের কী-বোর্ড পোর্ট ব্যবহৃত হয়। এই জন্য মাদারবোর্ডে ৫-পিনের সিরিয়াল পোর্টের পাশাপাশি ৬-পিনের বিশেষ সিরিয়াল PS/2 পোর্টও থাকে। এতে ৬-পিন বিশিষ্ট DIN কালেক্টর ব্যবহৃত হয়।

৬. নেটওয়ার্কিং পোর্টঃ

একাধিক কম্পিউটার ও এদের সাথে সংযুক্ত সকল ডিভাইসসমূহের (Printer, Scanner)-এর মধ্যে সংযোগ এবং সম্পর্ক দ্বারা গড়ে ওঠে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। পিসিতে নেটওয়ার্কিং-এর জন্য নেটওয়ার্কিং কার্ড ব্যবহার করা হয়। যেমন- LAN Card.

পোর্ট (Port)

৭. অডিও পোর্ট :

মাল্টিমিডিয়া পিসিতে ফোন এবং মাইক্রোফোন উভয় ধরনের পোর্টই যুক্ত থাকে। অডিও ইন করার জন্য অডিও পোর্ট অডিও আউট করার জন্য অডিও আউট বা স্পিকার পোর্ট ব্যবহার করা হয় ।

৮. ভিডিও পোর্ট :

মাল্টিমিডিয়া পিসিতে ভিডিও-এর জন্য আলাদা কার্ড ব্যবহার করা হয়। ভিডিও ইন বা আউটপুট পোর্ট ব্যবহার করা হয় ।

পোর্ট (Port)

৯. গেম পোর্ট :

কম্পিউটারে গেম যথার্থ উপভোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয় জয়স্টিক নামে একটি ডিভাইস। এই ডিভাইস ব্যবহারের জন্য মাদারবোর্ডের সাথে যে পোর্ট থাকে তাকেই বলে গেম পোর্ট। একটি আদর্শ গেম পোর্টে ১৫ পিন বিশিষ্ট কানেক্টর থাকে।

১০. মাউস পোর্ট : পার্সোনাল কম্পিউটারে ব্যবহৃত মাউস পোর্টসমূহ সাধারণত সিরিয়াল পোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণত ৯-পিন-এর সিরিয়াল পোর্টের সাথে মাউসের সংযোগ দেওয়া হয়। পার্সোনাল কম্পিউটারে PS/2 টাইপের পোর্ট ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটার সফটওয়্যার

প্রানিদেহের সাথে কম্পিউটারের তুলনা করলে বলা যায় , কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার হচ্ছে দেহ আর সফটওয়্যার হচ্ছে প্রাণশক্তি।

কম্পিউটার সফটওয়্যার বলতে একগুচ্ছ কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কর্মপদ্ধতি ও ব্যবহারবিধিকে বোঝায়, যার সাহায্যে কম্পিউটারে কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদন করা যায়।

বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক সফটওয়্যার, যেমন- অফিস স্যুট অ্যাপলিকেশন, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের চিঠিপত্র, বিল, হিসাবপত্র, তথ্য ভান্ডার তৈরি করা যায়।

কম্পিউটার সফটওয়্যার

আবার কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের সফটওয়্যার চালানো ও সার্বিকভাবে কম্পিউটার পরিচালনার জন্য এক প্রকারের সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলিকে বলা হয় অপারেটিং সিস্টেম, যেমন লিনাক্স, ম্যাক ওএস, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, ইত্যাদি। এ ধরনের সফটওয়্যারগুলি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য সফটওয়্যারের মাঝে সমন্বয় সাধন করে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে সকল প্রকারের কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।

এছাড়া প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের সফটওয়্যার তৈরি করা হয় যা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নামে পরিচিত।

কম্পিউটার সফটওয়্যার

সফটওয়্যার প্রধানতঃ ৩ প্রকারঃ-

সিস্টেম সফটওয়্যার	প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার	এপ্লিকেশন সফটওয়্যার

কম্পিউটার সফটওয়্যার

১. সিস্টেম সফটওয়্যার

সিস্টেম সফটওয়্যার একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার যেটার নকশা করা হয়েছে, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার কে পরিচালনা করার জন্য এবং এপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলোকে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ প্রদানের জন্য।

২. প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার

প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার হল একধরণের কম্পিউটার প্রোগ্রাম অথবা এ্যাপ্লিকেশন যা সফটওয়্যার উন্নয়নকারীগণ ব্যবহার করে থাকেন কোনো সফটওয়্যার তৈরি, ডিবাগ, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অন্য প্রোগ্রাম বা এপ্লিকেশনগুলোকে সহযোগিতা করতে।

কম্পিউটার সফটওয়্যার

৩. এপ্লিকেশন সফটওয়্যার

এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরী করা হয় ব্যবহারকরীর চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য। এপ্লিকেশন সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম, ইউটিলিটি সফটওয়্যার, এবং একটি প্রোগ্রামিং ভাষা সফটওয়্যার থেকে ভিন্ন। এটি যে কাজের জন্য তৈরী করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এটা লেখা, সংখ্যা, ছবি অথবা এই সবগুলোর সমন্বয়ে হতে পারে। কিছু কিছু এপ্লিকেশন প্যাকেজ কম্পিউটারের একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য হতে পারে যা সবাই ব্যবহার করে একই উদ্দেশ্য এবং এটি শুধু একটি সুবিধা বা উদ্দেশ্যের উপর জোর দেয় যেমন ওয়ার্ড প্রসেসিং। এপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম (ব্যবহারকারীর প্রয়োজন বা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে পোগ্রাম তৈরি করা হয়) এবং প্যাকেজ সফটওয়্যার।

BIOS (Basic Input/Output System)

কম্পিউটার চালু করলে সর্বপ্রথম BIOS কাজ শুরু করে। এটি চালু হলে কম্পিউটারের বাইরের সংযুক্ত বিভিন্ন অংশ যেমন HDD, Keyboard, Mouse ইত্যাদির সাথে কম্পিউটার সিস্টেমের তথ্যপ্রবাহ শুরু হয়। কম্পিউটারের ROM এ BIOS সংরক্ষিত থাকে। BIOS কে ফার্মওয়্যারও বলা হয়।

বুট (Boot) – এ সময় কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি থেকে অপারেটিং সিস্টেমকে RAM এ নিয়ে আসে। BIOS বুট ডিভাইসকে সনাক্ত করে তাতে সফটওয়্যার ইনস্টল করে পিসির কন্ট্রোল বুট ডিভাইসকে দেয়। একে বুটিং বলে।

Assembler – কম্পিউটারের নির্দেশকে ০ এবং ১ এ পরিণত করে।

ধন্যবাদ